লাল টিপ লাল শাড়ি

লাল টিপ লাল শাড়ি

মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

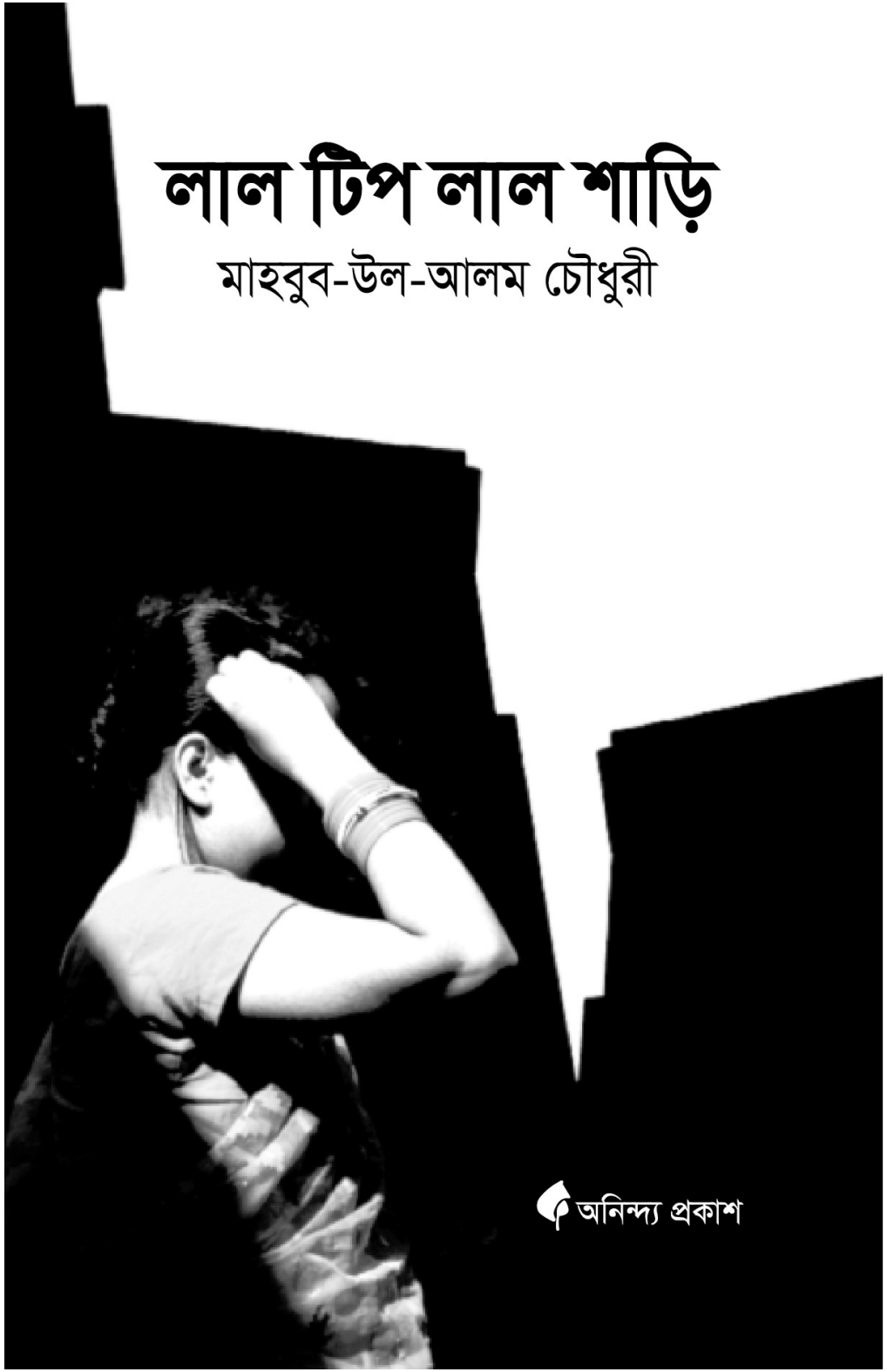

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২-১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Lal Tip Lal Sharee By **Mahbub-Ul-Alam Chowdhury**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95422 0 9

ঘরে বসে **অনিন্দ্য প্রকাশ**-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

বাবা বলতেন, ‘বাতিঘর যেমন সমুদ্রের জাহাজকে
সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়, তেমনি সমাজে কিছু
মানুষ প্রয়োজন যারা বাতিঘররূপে সমাজ তথা
রাষ্ট্রকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে।’
জানি না বাবা আমাকে বাতিঘর বানাতে
চেয়েছিলেন কি না।
আমি যাকে বাতিঘর বানানোর স্বপ্ন দেখি—
মশিউর-রেজা-চৌধুরী

মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিত্যনৈমিত্তিক, তবু প্রতিটি মৃত্যুই মানুষকে কিছু বলতে চায়। কোনো একটি সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চুপ করে থাকে। মৃত্যুর কোনো উচ্চারণ নেই, তবু অস্ফুট কিছু নীরবে বলেও যায়।

—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মকাল।

দস্তা রঙের পুরু মেঘের ভেতর থেকে টুক করে সূর্যটা বের হয়ে এলো। যেন ঘোমটা খুলে লজ্জা ভাঙল। সূর্যরশ্মিগুলো থিয়েটারের আলোর মতো চারদিক ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ছে। বিকেল বলে আলো খানিকটা মায়াবী। দুপুরে ঝুমবৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপর মেঘভাঙা রোদও উঠেছিল। দেখা গিয়েছিল নীল জলের মতো আকাশ। এখন আবার রোদ, তার ভেতর চিড়িচিড়ি বৃষ্টি। ছোটোবেলায় এরকম বৃষ্টিকে বলতাম— 'রোদ আর বৃষ্টি পাতিশেয়ালের বিয়ে।'

রামধনু রং মেখেছে পুব আকাশে। পুবালি ঝিরিঝিরি হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ার চিরল চিরল পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছে। ভেজা মাটির গন্ধ বাতাসে। নিচু একটা জায়গায় পানি জমে আছে এখনো। সেই পানিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। সামান্য বাতাসে পানি নড়ছে, ওর ছায়া ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। দুই-তিন-পাঁচ টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে একটা মানুষের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

কোনো মানুষই তো একটা মানুষ নয়। বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে হয়ে যায় বিভিন্নরকম। একটা হলুদ প্রজাপতি ওর মাথার চারদিকে ফিনফিনে পাখায় উড়ে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর বসল বাম হাতে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল প্রজাপতিটাকে। দেখল হাতের কবজি উলটে ঘড়ি।

ঘড়িতে ছয়টা বেজে সাত।

ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের সময় সন্ধ্যা সাতটা। অনেক আগেই পৌঁছল। যদিও আমাদের দেশে সঠিক সময়ে ডাক্তারদের সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই ভাগ্যের বিষয়! তবুও সময়মতো পৌঁছে গেল। ক্লিনিকটি দশ তলা ভবনে। আধুনিক লিফ্ট। ভবনের বাইরের অংশ পুরু গ্লাস দ্বারা বেষ্টিত। নাম 'বাতিঘর'। নামের আগেপরে অন্যকিছু লেখা নেই। শুধু নামের নিচে ব্র্যাকেটে লেখা 'মাদক নিরাময়কেন্দ্র'। বাতিঘর নামটি খুবই অদ্ভুত মনে হলো। এই ধরনের নাম কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকের হতে পারে তা ওর জানা নেই। আগেও নজরে আসেনি। বাতিঘর মানে জাহাজকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে স্থাপিত আলোর উঁচু বাতিঘর বা লাইট হাউজ।

পৃথিবীর আলোচিত বাতিঘর আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় তৈরি করা হয় সেই বাতিঘর। প্রথমে বন্দরের পরিচিতি চিহ্ন হিসেবে তৈরি করা হলেও পরবর্তীকালে এটি বাতিঘর হিসেবে কাজ করে, যা প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটি।

যাহোক, এই বাতিঘর সপ্তাশ্চর্যের মতো কিছু না হলেও মাদকাসক্তদের নিরাময়ে মালিকপক্ষের মহৎ উদ্দেশ্য যে আছে তা কিছুটা হলেও বোঝা যাচ্ছে।

বাতিঘর দশ তলা ভবনটির নিচতলা থেকে চার তলা পর্যন্ত। চমৎকার সিঁড়ি বেয়ে বাতিঘরে ঢুকে পড়ল ও। মেঝেতে দামি টাইলস। ইলেকট্রিক্যাল সুইচবোর্ড-সহ সকল ফিটিংস আধুনিক। মনে হচ্ছে এগুলো বিদেশি। তবে শুনেছে এ দেশেই এখন অনেক উন্নতমানের ফিটিংস পাওয়া যায়। রিসেপশনিস্টের টেবিলটি ফিরোজা মারবেল পাথরের। কী আশ্চর্য! রিসেপশনিস্ট ফিরোজা রঙের একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে আছে। হয়তো কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। কিংবা

কাকতালীয়ও হতে পারে। অন্যদিন এলে লক্ষ করতে হবে। নিজেকে নিজে বলল।

একজন রিসেপশনিস্ট যতটা আকর্ষণীয় হওয়ার প্রয়োজন, মেয়েটা ততটা নয়। গায়ের রং মোমের মতো সাদা হলেও সামনের দাঁত উঁচু। ঠিক দাঁত নয় মাড়ি। আর সামনের দাঁত দুটি অনেকাংশে ফাঁকা। কথায় আছে, সামনের দাঁত ফাঁকা মেয়েদের স্বামী বেশিদিন বাঁচে না! মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে ওর স্বামী আছে কি না? আদৌ বিয়ে হয়েছে কি? পরিবেশ অনুসারে রিসেপশনিস্টকে মানানসই মনে হয় না। মালিকের আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হয়তো। আমাদের দেশে তো আবার অনেকক্ষেত্রে আত্মীয়করণের ভাইরাস বিরাজমান। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি সেই প্রজেক্টেরই অংশ মনে হয়।

যতটুকু মনে পড়ে ঢাকার হাসপাতালগুলো এক সময় বেশিরভাগই ছিল অনেক নোংরা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাথরুম ব্যবহার করা ছিল খুবই কষ্টকর।

বিষয়টি কিছুটা এরকম... অনেক বছর আগের কথা। ওর এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে ঢাকার এক সরকারি হাসপাতালে যায়। অসময়ে পেটে মোচড় দিয়ে উঠল, কোনোভাবেই সামলানো যাচ্ছিল না বাথরুম প্রেশার। অগত্যা ঢুকে পড়তে হলো ছোটো ঘরে। অসহ্য দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে নাক ধরে বসে থাকে। বিশেষ কর্ম শেষ করে যখন পানি খরচ করবে, 'মানে সুচু', তখন দুই হাতের প্রয়োজন অবশ্যই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নাক ছাড়তেই অসহ্য গন্ধে বমির উদ্রেক হলো। তখন কী করবে? পানি ব্যবহার করবে নাকি বমি সামলাবে? সংক্ষেপে এই হলো তখনকার হাসপাতালের চিত্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আগের মতো নেই। এখানেও সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র, যা দেখে ওর ভালোই লাগল।

লক্ষ করল, বারো বছরে ঢাকা শহরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে অনেক ফ্লাইওভারও। হয়তো আরও বারো বছর পর দেশে এলে দেখা যাবে পুরো ঢাকা শহর দোতলা হয়ে গেছে। হাইরাইজ বিল্ডিংও যত্রতত্র।

মনে পড়ে ও যখন ঢাকায় প্রথম এলো, তখন দোতলা বাস (ডবল ডেকার) দেখে খুবই অবাক হয়। গাড়ি দোতলা হতে পারে এটা ওর ধারণাই ছিল না।

কুসুমপুর গ্রামে জমিদারদের পুরোনো দোতলা বাড়ি দেখেছে। সেখানেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু দোতলা গাড়ি! ওর ছোটোবেলার বন্ধু আশিক, জমিদার বাড়িরই সন্তান। একদিন আশিক জোর করে ওদের দোতলার ছাদে নিয়ে যায়। সেখান থেকে নিচে তাকিয়ে ওর অনেক ভয় লাগে। সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। এক পর্যায়ে আবিষ্কার করল, হাফপ্যান্ট ভিজে গেছে। আশিক সে কথা বলে এখনো ওকে লজ্জা দেয়।

সেবার ছোটো মামা দোতলা গাড়িতে চড়িয়ে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়। তখন একমাত্র গুলিস্তান থেকে মিরপুর চিড়িয়াখানায় দোতলা বাস চলাচল করত। মনে আছে— গাড়ির দোতলায় উঠে একেবারে সামনের জানালার কাছে গিয়ে বসে। গাড়ি চলা শুরু করলে অবাক হলো, মনে হলো— রাস্তার মানুষ ও রিকশাগুলো সমানে দোতলা বাসের তলদেশে চলে যাচ্ছে! এ কী আজব কাণ্ড! এই দৃশ্য ওকে খুব কষ্ট দেয়। ছোটো মামাকে বিষয়টা জিজ্ঞেস করার পর ভুল ভাঙল।

চিড়িয়াখানায় ঢুকে আরও বেশি অবাক হলো, দোতলার মতো একটা প্রাণী দেখে! পরে জানল, এই প্রাণীর নাম জিরাফ। চিড়িয়াখানায় অনেক প্রাণীই সেবার প্রথম দেখে। পরে দেশবিদেশের

অনেক জায়গায় জিরাফ দেখেছে। যতবার জিরাফ দেখেছে, ততবারই ওর মনে হয়েছে এরা সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র ওদের শরীরে ধারণ করেছে। জিরাফের গায়ে প্রিয় বাংলাদেশের মানচিত্রও আছে। যখন ওদের শরীরে হাত রাখত, মনে হতো বাংলা মায়ের শরীর স্পর্শ করছে।

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে— এই ভেবে ওর চোখে পানি চলে আসে। এই চোখের পানি ভালোবাসার। ভালোলাগার। ভাবল, প্রিয় মাতৃভূমি এগিয়ে চলার পেছনে ওর মতো প্রবাসীদের অবদান কতটুকু?

ভাবনাগুলো যতই এলোমেলো হোক-না কেন, চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। অনেকদিন ফুটপাতের টংঘরে চা খাওয়া হয়নি, যা ছাত্রজীবন থেকেই নেশা। বারো বছর পর দেশে এসেছে। হাসপাতালের ক্যানটিনে না ঢুকে চলে গেল রাস্তার পাশের খুপরি দোকানে।

মাটিতে পোঁতা বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন গল্প করছে। ও সেখানটায় বসে। চায়ের কাপে তখনো চুমুক দেওয়া হয়নি। দোকানির কাছে পানি চাইল। ঠিক তখনই ওর দৃষ্টি আটকে গেল একটি জ্বলন্ত সিগারেটের প্রতি; যা দুই আঙুলের মাঝে আটকে আছে। মনে হলো, ওই হাতে সিগারেট একেবারে বেমানান। ধবধবে সাদা লোমহীন হাতের কোমল দুই আঙুলের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেটের অসহায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছে। ও সেদিকেই তাকিয়ে রইল ভাবলেশহীন ভাবে। কিছুক্ষণ পর ভুল ভাঙল যখন জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে নেয়। ওই ঠোঁট অতিশয় সুন্দরী এক তর"ণীর।

বয়স বিশ-একুশ। গায়ে টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট আর দামি ব্র্যান্ড জুতো। বাদামি রঙের চুল কাঁধ অবধি থাকায় সহজেই অনুমান হলো,

ও একজন মেয়ে। আর সেই মেয়েটির পাশে যে মেয়েটি বসে আছে, তার বয়স অন্যজনের চেয়ে দু-তিন বছরের বেশি হবে বলে মনে হয়। সাদা ফতুয়ার সাথে কালো গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট। দুজনই যথেষ্ট স্মার্ট।

ভাবনার বিষয় হলো, এরকম পাবলিক প্লেসে টংঘরে বসে দুজন সুন্দরী যুবতির সিগারেট খাওয়া! অবাক হলেও পাশের অন্যদের দেখা গেল ভাবলেশহীনভাবে চা খাচ্ছে। এদের ভেতর কয়েকজন দিনমজুরও আছে। দেখে মনে হলো এটা প্রতিদিনের দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে ওর মাথায় রক্ত উঠে যায়। খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নিজ উত্তেজনা নিরসনে নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে ওর। ও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করল। চোখ বন্ধ করে জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করল। ও যখন জাতীয় সংগীত আওড়াল, তখন সকল সত্তা ভর করে ওর ওপর। বারবার গাইতে লাগল।

মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন...

এতে ওর উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে গেল।

শ্যামলীর রিং রোডে সিটি কর্পোরেশনের মাঠের পাশে যে খুপরি দোকান, যেখানে চা খেতে ঢুকেছে। এলাকাটা তেমন পরিচিত নয়। যতটুকু মনে হচ্ছে এখানে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি না থাকলেও একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ আছে। মেয়ে দুটি হয়তো সেখানকার স্টুডেন্ট।

ভাবছে, দেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সেই স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক এই মেয়ে দুটিও। মেয়ে দুটির ভাবখানা এমন— দেশ উন্নয়নে-ফুন্নয়নে ওদের কী আসে যায়?

ওরা তো এই স্বাধীন দেশেরই নাগরিক। স্বাধীনই থাকবে।

ও পুনরায় ফিরে এলো ক্লিনিকে। রতনকে নিয়ে রিসেপশনে বসে আছে। রতনকে ডাক্তার দেখাবে। রতনকে ডাক্তার দেখানো ওর কাজ নয় কিংবা এটি না করলেও পারত। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় আজ এখানে আসা।

হৃদয় দেশে এলে যতদিন কুসুমপুর গ্রামের বাড়ি অবস্থান করত, ততদিন রতন নামের সাত-আট বছরের এক প্রাণচঞ্চল ছেলে ওর সাথে আঠার মতো লেগে থাকত। বন্ধুর ছোটো ভাই। বন্ধুর অকালমৃত্যুতে রতনের প্রতি ভালোবাসার মাত্রা ছিল একটু অন্য ধরনের।

সাহসী রতন যতটা-না ডানপিটে, তার চেয়ে বেশি ছিল পড়ালেখায় অমনোযোগী। এবার বাড়ি ফিরে সেই রতনকে চিনতে সময় লাগল! অবাক হলো হৃদয়! রতন পা টেনে টেনে হাঁটছে। ওকে দেখে হাঁটার জোর আরও বাড়িয়ে দিলো রতন। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে চোখের আড়াল হতে। কিন্তু শরীরে শক্তি পাচ্ছিল না বোঝা যাচ্ছে। বারো বছর আগে রতন এরকম ছিল না।

এবার ঢাকা যাওয়ার সময় মাছ নেওয়ার দরকার ছিল এক ভদ্রলোকের জন্য। তাতে বরফ দেওয়ার প্রয়োজনে রতনকে পাঁচশো টাকা দিলো। টাকাটা নিয়ে রতন হাওয়া। তারপর থেকে আর কাছে আসতে দিত না। পরে জানা গেল এক ছাত্রনেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে রতন।

রতনের এই অবস্থা কেন? হৃদয় পরিচিত একজনকে জিজ্ঞেস করল।

বাবায় পেয়েছে। বলল পরিচিতজন।

বাবায় পেয়েছে! ও অবাক। পরে বুঝল, ইয়াবায় পেয়েছে। ওর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। এই এলাকায়ও বাবা পৌঁছে গেছে! আর

রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় ছাড়া কি এটা সম্ভব?

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ফেসবুক স্ট্যাটাসে দেখেছি, 'আমার এলাকা রাখিব মাদকমুক্ত'। অথচ তাদের এলাকায় দৃষ্টির আড়ালে চলছে এমন ভয়ংকর অপকর্ম!

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বাহবা না নিয়ে বাস্তবে কিছু দেখান। আমাদের রতনদের বাঁচান। আমাদের সন্তানদের বাঁচান। এই প্রজন্মকে বাঁচান। আগামী প্রজন্মকে বাঁচান। তবেই আমরা বেঁচে থাকব, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আর সার্থক হবে রাজনীতি করা, সার্থক হবে বেঁচে থাকা। দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চায় হৃদয়—

এবার বাড়ি এলে রাতে এলাকার কিছুলোকের সাথে আলাপ করে পুরো ইয়াবার ইতিহাস শুনে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। কোত্থেকে আসে? কারা এই ব্যবসায় জড়িত? কারা সেবন করে? বাকি রাত আর ঘুম হলো না ওর। সবচেয়ে অবাক ও ভাবনার বিষয়, দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে নিরাপদ রুট ভোলা জেলায় কালু মাঝির ঘাট। টেকনাফ থেকে মাছের ট্রলারে নৌপথে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বিশাল বিশাল ইয়াবার চালান পৌঁছে যায় ওর জেলায়। সেখান থেকে সম্পূর্ণ দক্ষিণ অঞ্চল ছেয়ে যায় এই মরণব্যাধি ইয়াবা। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এই তরুণ সমাজকে রক্ষা করার আর কেউ নেই।

হৃদয় সকালেই রতনদের বাড়ি যায়। এবং ওইদিনই রতনকে নিয়ে লঞ্চযোগে ঢাকায় চলে আসে। শ্যামলীর রিং রোডে মাদক নিরাময়কেন্দ্রে রতনকে ডাক্তার দেখাতেই এখানে আসা। চায় রতনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। যেন কোনো রতনের জীবন এভাবে অভিশপ্ত না হয়। ঝরে না যায় এই সমাজ থেকে। গত বারো

বছর যে কষ্টের জীবন হৃদয় বহন করছে, সে জীবন যেন আর কারো কাছে অভিশপ্ত হয়ে না আসে।

ডাক্তার জোসেফ কি এসেছেন? হৃদয় রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার আসতে আরও আধঘণ্টা লাগবে। রিসেপশনিস্ট ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

এই প্রথম মেয়েটির চোখ দেখল। চোখদুটি কোকিলের চোখের মতো। কোকিলের কণ্ঠ সুন্দর হলেও তাদের চোখের ধার কম। কোকিলের সবচেয়ে বড়ো অযোগ্যতা, ওরা নিজেদের বাসা বানাতে পারে না। জন্ম হয় অন্যের বাসায়। নিজ মায়ের শরীরের তাপে নয়, অন্যের শরীরের তাপে-উমে বেড়ে ওঠে। এই মেয়েটির বেড়ে ওঠার ইতিহাস হৃদয়ের জানা নেই।

আরও এক ঘণ্টা পর ডাক্তারের সাক্ষাৎ পেল। গম্ভীর এবং শান্ত মানুষ। চেহারা ও পোশাকে অভিজাত ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে। মুখে প্রায় কথা নেই বললেই চলে। ভুরু সামান্য কুঁচকে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন রতনকে বাতিঘরে ভর্তি করানোর জন্য। ডাক্তার এও বললেন, রতন পুরো সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে।

রতনকে ভর্তি করানোর প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে অনেক সময় ব্যয় হলো। ক্যাবিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই দেওয়া হয়েছে। একজোড়া স্যান্ডেল, টাওয়েল, টিসু, টুথব্রাশ দেওয়া হলেও পেস্ট দেওয়া হয়নি। বাইরে থেকে সেটা কিনে নিয়ে এলো হৃদয়। সাথে টুকটাক আরও কিছু নিল। রাতে অসময়ে রতনের খিদে পেতে পারে, এই ভেবে কিছু বিস্কুট ও আধা কেজি আপেলও নিল।

এভাবে অনেক রাত হয়ে গেল। ওর নজরে এলো রিসেপশনের দেওয়ালঘড়ি। দেখা গেল এগারোটা তেইশ মিনিট। রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরেছে হয়তো।

ওরও বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। বাতিঘর থেকে বের হয়েই হৃদয় একটি হলুদ ট্যাক্সি নিল বাসায় ফিরবে।

২

বাসায় ফিরে মনে পড়ে যায় বারো বছর আগের সেই ভয়াবহ একটি সন্ধ্যার ঘটনা— যে সন্ধ্যা ওর জীবনকে দেয় ওলটপালট করে।

ধানমন্ডির রাইফেল স্কয়ারে আগোরার ছাদের এককোনায় স্বজন স্টল। যার ভেতরে ঢুকেই তাজ্জব বনে গেল। সবকিছুই অবিশ্বাস্য লাগে। চারদিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! মৃদু আলো। ইংলিশ মিউজিক। ঝিক-ঝিক-ঝায়-ঝিয়-ইওইও শব্দে একটা পপ মিউজিক বাজছে ভেতরে। রক্ত গরম করা মিউজিক। শুনলেই হাত-পা নাচাতে ইচ্ছে করে। কোনো জানালা নেই। শুধু প্রবেশদ্বার। জমিদারি আদলের কয়েকটি কোলবালিশ। জমিদারি হুক্কা। তাতে বড়ো পাইপ নকশাকরা। পালাক্রমে এক একজন সেই পাইপটি মুখে নিয়ে জোরে শ্বাস টানছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। কাউকে ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না। তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে, যার ভেতর মিথিলা একজন। আর এই মিথিলাই ছিল হৃদয়ের বিবাহিত স্ত্রী।

বাংলাদেশে ওপেন স্পেসে নেশার আয়োজন, যা কল্পনার বাইরে। বুঝতে পারল, এটি একটি সিসার স্টল। সে সময় পত্রিকা থেকে ও যা জেনেছে :

'মাদকের তালিকায় যুক্ত হয়েছে সিসা। সিগারেটের চেয়েও

ভয়ংকর এই সিসা। আগে অভিজাত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে সাধারণের নাগালে পৌঁছে গেছে। গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আলো-আঁধারি পরিবেশে চার-পাঁচ তরুণ-তরুণী এক টেবিলে গোল হয়ে বসে গুড়গুড় শব্দে পাইপ টানতে থাকে। একই পাইপ একহাত থেকে যাচ্ছে আরেক হাতে। রাজধানীর অধিকাংশ নামিদামি রেস্টুরেন্টে এমন চিত্র নাকি এখন হরহামেশাই মিলছে। দামি রেস্টুরেন্টের মধ্যে আলাদা করে স্থান পাচ্ছে সিসা লাউঞ্জ। আর এই সিসায় তরুণ-তরুণীরাই ঝুঁকছে বেশি। তামাক বিশেষজ্ঞদের মতে, এক সেশন সিসা টানলে ৫৪টি সিগারেটের সমান ক্ষতি হয়। এছাড়া সিসার ধোঁয়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড থাকে, যা মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সিসা হার্বাল দিয়ে বানানো হলেও এতে হাই পাওয়ার কার্বন মনোক্সাইড থাকে। যেটা মস্তিষ্কে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বর্তমানে মেয়েরাও অনেক বেশি সিসা সেবন করে। তাদের মধ্যে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া হয় যে সিসা মেয়েদের নেশা।'

হৃদয়ের জন্ম কুসুমপুরে এক অজ পাড়াগাঁয়। গ্রামের কাদামাটি, ধুলায় মাখা, বৃষ্টিতে ভেজা, রোদে পোড়া, খোলা আকাশে উদ্দাম ছুটে চলা, দিঘির কালো জলে সাঁতার কাটা— এসব ছিল ছেলেবেলার নিত্য কর্মের অংশ।

ঢাকার একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেয় বিলাতে। সেখান থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজির ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। তারপর একটি প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু কর্মজীবন। কয়েক বছরের ভেতর নিজেই একটি সফটওয়্যার ফার্মের মালিক হয়। অর্জন

করে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব। কিন্তু শরীরে মাটির গন্ধ হারিয়ে যায়নি। ভাদ্রমাসের বেত্তালোদের (ভাদ্রমাসের কাদামাটি) মতোই ছিল ওর হৃদয়। অনেক ব্রিটিশ রমণীকে বিয়ে করার সুযোগ এলেও স্বপ্ন দেখত বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার। যে রমণীর পরনে থাকবে সুতিশাড়ি, কপালে লাল টিপ, হাতে পরবে কাচের চুড়ি। গভীর রাতে সেই চুড়ির ঝনঝন শব্দে ঘুম ভাঙবে। আর সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে জীবনের এতগুলো বছর পার করে দেয় হৃদয়।

বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক। সৎ আর সততাই ছিল যে বাবার ব্রত। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন বাবা। ওর জন্ম ও বেড়ে ওঠার ইতিহাস শুনেছে গোমস্তা রজব আলির মুখে। কিছু শুনেছে গ্রামবাসীর কাছে। কিন্তু ওর ছোটো মা এই বিষয়ে কোনোদিনই মুখ খোলেননি। হয়তো হৃদয়ের কষ্ট বাড়বে তাই।